বাংলা সংগীতের বিবর্তন

সংগীত সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে বাংলা কাব্যসংগীতের নিজস্ব রূপ গড়ে উঠেছে। যদিও নির্দিষ্ট ভাবে কেনো যুগবিভাগ করা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেকটি যুগই পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত—যার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংগীতের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। ধারাবাহিকতাকে এইভাবে দেখা যেতে পারে *(প্রদীপ ঘোষ, বিমল রায়সহ পর্বসূরী লেখকদের রচনার সহায়তায় প্রস্তুত পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত রেখাচিত্রটি দ্রষ্টব্য)*

আমাদের উল্লিখিত এই যুগ-বিভাজন থেকেই আমরা বাংলা গানের জন্মনক্ষত্রটির সন্ধান পাই। এই সন্ধানকে প্রায় এক সুদূর নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে ক্রম-বিকাশমান বাংলা কাব্যসংগীতের জন্মরেখাটিকে চিহ্নিতকরণের প্রয়াস বলা যেতে পারে।

দিলীপকুমার রায়, নারায়ণ চৌধুরী, প্রদীপ ঘোষ, সুকুমার সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিমল রায়, উৎপলা গোস্বামী, করুণাময় গোস্বামী, দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার, রাজ্যেশ্বর মিত্র, অরুণকুমার বসু সহ অপরাপর সংগীত তাত্ত্বিকদের ভাষ্য ও গবেষণার সহায়তায় আমরা ভারতীয় সংগীতের সমৃদ্ধ পরিসরটির মধ্যে বাংলা গানের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করতে পারি। হাজার বছরের বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিবৃত্ত রচনা করা শুধু কঠিন কাজ নয়, আমাদের এই গবেষণা পত্রের পরিসরে তা অসম্ভবও বটে। আমরা অতি সংক্ষেপে এবং কিছুটা খণ্ডিতভাবে সামান্য চেষ্টা করতে পারি মাত্র। বস্তুত কিছু অনুমান ব্যতিরেকে এই আলোচনায় প্রতি পদে-পূর্বজদের কাছে সকৃতজ্ঞ ও আপাদমাথা ঋণস্বীকার না করে আমাদের উপায় নেই।[২২]

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম সভ্য দেশের সংগীত সেই সব দেশেরই আদিম নাচ-গান বাজনারই ক্রমবিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আদিম মানুষ ছিল সভ্যতা-পূর্ববর্তী সময়ের মানুষের পাশবিক অবস্থায়, যেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে সভ্যতার দিকে

এগিয়ে উন্নীত হয় সভ্যতার আদি অবস্থায়। আদিম গান প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিল দু'ধরনের—ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ বা সামাজিক, মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বরক্ষা, প্রকৃতির

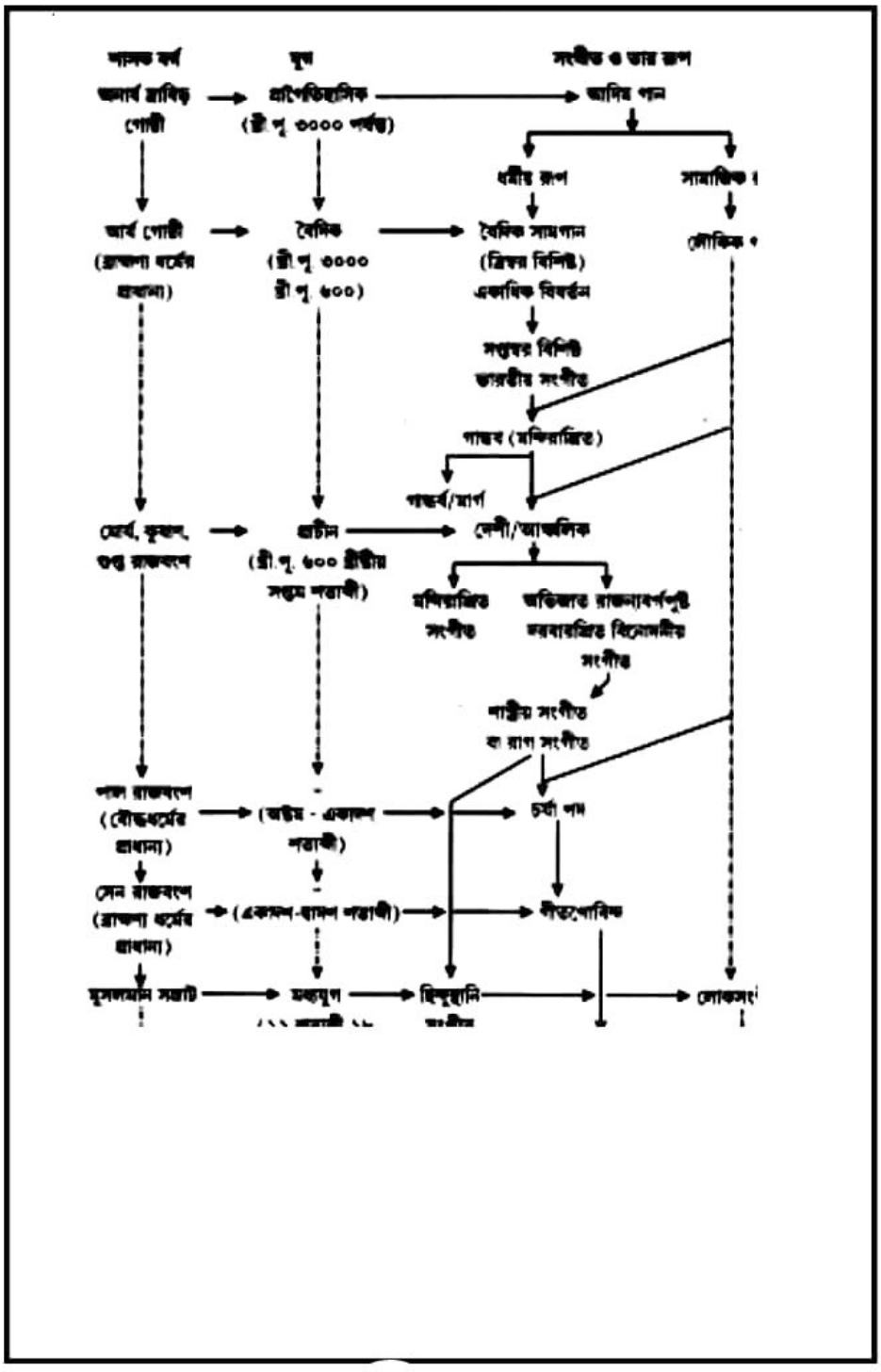

রোষ থেকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মুক্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য আদিম মানুষরা উৎসর্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করত।

তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এই অনুষ্ঠান ঘিরে তারা নাচ-গান করত। এই অনুষ্ঠান পরবর্তীতে বৈদিকযুগে 'বৈদিকযজ্ঞে' বিবর্তিত হয়। আদিম গানের প্রকৃতি ছিল সরল। একঘেয়ে, অবরোহী গতিক। এই গান উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রাম অভিমুখী হয়ে আবার উচ্চগ্রাম অভিমুখে যাবার চেষ্টা করত। অপরদিকে সামাজিক গান থেকে জন্ম নিল লৌকিক গান। যদিও আদিমগানের রূপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যেটুকু বোঝা যায় তা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত বাঁশী, মৃদঙ্গ, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, করতাল, নৃত্যশীলা নারীমূর্তি, নর্তকের মূর্তি, চামড়ার বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি সংগীতের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে।

ভারতীয় সংগীতের ধারাটি ভারতেতিহাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে বিকীর্ণ হয়ে আছে। (পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্র : দুই দ্রষ্টব্য)

দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ সাধন ঘটায়। এই যুগের সংগীতের মোটমুটি একটা সুষ্ঠুরূপ পাওয়া যায়। দ্রাবিড় সভ্যতার ধর্মীয় সংগীত থেকে এ-যুগে ত্রিস্বরবিশিষ্ট সামগান সৃষ্টি হয়। এগুলি ছিল প্রার্থনার স্তোত্রধ্বনি বা সংগীত যা থেকে ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি বলে তাত্ত্বিকেরা মনে করেন। প্রার্থনার স্তোত্রধ্বনি থেকে উদ্ভব বলে ভারতীয় সংগীতের রস শান্ত, আত্মসমাহিত, গভীর-গম্ভীর। প্রথমদিকে সামগান সম্মিলিত ভাবে গাওয়া হতো বৈদিকযজ্ঞে এবং এর রূপ ছিল সহজ, অনাড়ম্বর। ক্রমবিকাশের পথ ধরে এই গান হয়ে ওঠে ক্রমশ আড়ম্বরপূর্ণ, অলঙ্কার বহুল। এ-গান ছিল বৈদিকযুগের অভিজাত গান এবং একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরদিকে এই সময় আদিম সামাজিক গান থেকে জন্ম নেয় লৌকিক গান। গানের সুর কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এ গানে। লৌকিক গান থেকেই জন্ম নিয়েছিল পরবর্তীকালে বিচিত্র পল্লীগান বা লোকগান। বৈদিকযুগের এই লৌকিক 'গানের একাংশ সামান্যকিছু নিয়মবদ্ধ হয়ে এবং আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্য, গেয়-ভঙ্গিবৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল তুলনামূলকভাবে সাধারণের গান—প্রদীপ ঘোষ যাকে বলেছেন 'দেশীগান।'[২৩] অপরদিকে সামগানের সংগীতিক ঐতিহ্য থেকে

রূপ নেয় গান্ধর্ব সংগীত। গান, মৃদঙ্গ এবং বেণু-বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনের সম্মিলিত প্রয়াস থাকত গান্ধর্ব সংগীতে। এ-সংগীতে লৌকিক দেশী বা আঞ্চলিক গানের কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তবে এ সংগীত ছিল নিয়মাবদ্ধ অভিজাত সংগীত এবং মন্দিরাশ্রিত। গান্ধর্বযুগে রাগের আবির্ভাব হলেও তাকে ঠিক রাগ বলা সঙ্গত নয়, কারণ—রাগের প্রধান উপজীব্য আলাপ তখন ব্যবহৃত হত না। আলাপ হলো—রাগের সম্যক পরিচয় জ্ঞাপক স্বরসমষ্টি যা রাগের প্রধান উপজীব্য, বিষয়। গান্ধর্বযুগে পরের দিকে গানের শুরুতে রাগালাপের ব্যবহার শুরু হয়। তবে বর্তমানের মতো তার রূপ ছিল না এবং সংক্ষিপ্ত হতো।

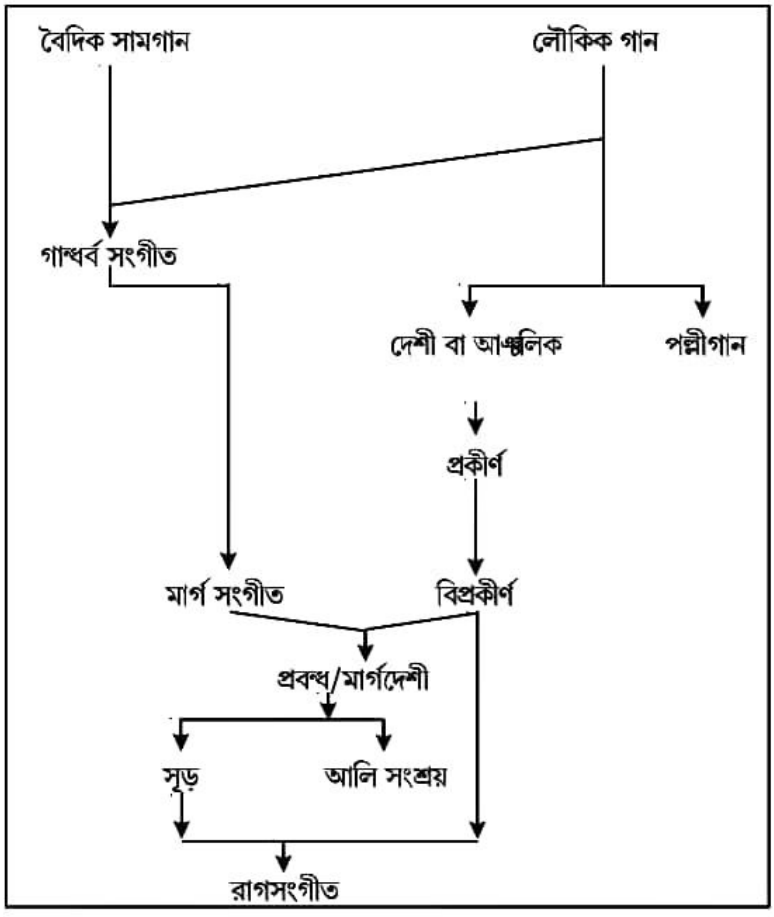

রেখাচিত্র দুই

বৌদ্ধযুগে (খ্রী.পূ. ষষ্ঠ শতক) দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবাহী গান্ধর্বসংগীতের ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং লৌকিক গান প্রাধান্য পায় এবং এর একটা অংশ আভিজাত্য পায়। বেদবিরোধী, ব্রাহ্মণ বিরোধী এবং সংস্কৃত ভাষা বিরোধী বৌদ্ধরা

দেশীয় ভাষা-কৃষ্টিকে সম্মান জানিয়ে এর বিকাশ সাধনে প্রয়াসী হন। দেশজ বা আঞ্চ লিক জনপ্রিয় সুরগুলি কিঞ্চি ৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দেশী রাগ হিসাবে বিকশিত হতে শুরু করে —জন্ম নেয় দেশী বা আঞ্চ লিক গান এবং অন্যগুলি হয় পল্লীগান।

বৌদ্ধ যুগের প্রাধান্য স্তিমিত হয়ে এলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়। এই সময় প্রাধান্য পায় নাট্যসংগীত বা মার্গসংগীত খ্রীস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগে। নাটকে ব্যবহৃত এ সংগীতকে বলা হত 'ধ্রুবা'। নাটকের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ছোটো ছোটো গান অন্তরাল থেকে প্রয়োগ করা হত। এগান ছিল ছন্দ প্রধান, কঠিন ভাবে নিয়মাবদ্ধ। ভারতের পরে নিয়মের কড়াকড়িতে শিথিলতা আসে। ভাব-সুর প্রাধান্য পেতে থাকে। ধীরে ধীরে গান্ধ র্ব সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মার্গ সংগীত ও গান্ধ র্ব সংগীত সমার্থক হয়ে পড়ে। দর্শকদের মনোরঞ্জন নাট্য সংগীতের উদ্দেশ্য হওয়ায় এতে লিরিকের গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। লিরিকের প্রাধান্য যাতে কমে না যায় বা অর্থ যাতে অস্পষ্ট না হয়ে পড়ে তার জন্য এ গানে অলংকারবহুল সুর ব্যবহৃত হতো না। অপরদিকে গান্ধ র্ব সংগীত ছিল ধর্মীয় সংগীত—ঈশ্বরস্তুতি-এর উপজীব্য হওয়ায় কথার বা লিরিকের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ কম। তুলনায় ভাব বেশি। সুপ্রাচীন কালের সংগীতের এই ধারাগুলির তৎকালীন রূপ বর্তমানে না থাকলেও এগুলি বর্তমানের সংগীত ধারার ভিত্তি-স্বরূপ। অর্থাৎ এই প্রাচীন সংগীতের ভিতের উপর বর্তমান সংগীতের প্রতিষ্ঠা তবে নতুন সাজে নতুন রূপে। আর এই নতুনত্ব আনয়নের ক্ষেত্রে চলেছে অনেক গ্রহণ-বর্জন, যার পেছনে প্রধান ভূমিকা রয়েছে মুসলমান ও পাশ্চ াত্য সংগীত ধারার।

. খ্রীস্ট পূর্বাব্দ যুগ থেকে পঞ্চ দশ শতক পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত রাগাশ্রিত গানকে একত্রে 'প্রবন্ধ ' বলা হতো। প্রবন্ধ কে 'কম্পোজিশন' বলা যায়। এগুলির নির্দিষ্ট কোনো শৈলী বা ফর্ম ছিল না বর্তমানের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ইত্যাদির মতো। বিভিন্ন ধরনের গানের ফর্ম এর মধ্যে একত্রে ছিল—তাই এর ফর্ম-এর নির্দিষ্টতা ছিল না, তবে এগুলি নিয়মাবদ্ধ ছিল।

বহু আলোচনায় ক্লিশে হলেও বলা আবশ্যক যে, বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সংগীতের প্রথম প্রামাণিক নিদর্শন 'চর্যাপদ'। বিপ্রকীর্ণ শ্রেণীর প্রবন্ধ গীত চর্যাপদগুলিতে বাংলাগানের মূল নিহিত আছে। চর্যার পদগুলি রচিত হয়েছিল সন্ধ্যা বা হেঁয়ালি ভাষায়

এবং এগুলি ছিল বৌদ্ধ দের উপাসনাগীত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, 'চর্য্যাপদগুলি সহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান।' এবং এগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতোই গীত হতো। বিভিন্ন কবির রচনাকে গীতি বা গীতিকা বলেই উল্লেখ করেছেন আলোচকেরা। পদগুলির শিরোদেশে পটমঞ্জরী, গড়া, গবড়া, অরু, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, ভৈরবী, গউড়া, বরাড়ী, গুঞ্জরী, শররী, বলাড্ডি, মল্লারী, মালশী, মালসী গবুড়া, কহ্নু গুঞ্জরী, বঙ্গাল, শবরী ইত্যাদি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঠপ্রমাদ, লিপিভ্রান্তি কিংবা মুদ্রণ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ধরে নিলেও সেকালও কাব্যাশ্রয়ী সংগীত চর্চার পরিসরটির বিস্তৃতির একটা আভাস এর থেকে আমরা পেতে পারি। রাগগুলির রূপ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়, সে সময়ে বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা হত্তে এবং রাগরাগিণী নিয়ে পরীক্ষা-এক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বোঝা যায় রাগের মিশ্রণের উল্লেখ দেখে।[২৩ক]

পাল বংশের পর সেনবংশ শাসনভার গ্রহণ করে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। লক্ষণ সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় (রাজত্বকালারম্ভ : ১১৭৮-৭৯) সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' কাব্য। ভারতের সংগীত ও নৃত্যকলার ইতিহাসে অতুলনীয় স্থান দখলকারী সর্বভারতীয় কাব্যটি সংস্কৃতভাষায় রচিত হলেও ব্যবহৃত শব্দ বাংলাভাষার বা শব্দের কাছাকাছি। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সংগীতময় কাব্য গীতগোবিন্দর পদগুলি রাগ, তাল, নৃত্য, গীত সহযোগে পরিবেশিত হত। মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি, কর্ণাট, দেশাখ, দেশ-বরাড়ী, বরাড়ী, গোন্ড কিরি, ভৈরবী, বিভাস—মোট ১১টি রাগে এবং রূপক, যতি, নিঃসার, একতালী, অষ্টতালী তালের উল্লেখ পদগুলিতে পাওয়া যায়।[২৪] গানগুলি আটটি কালিকায় রচিত বলে একে অষ্টপদী গান বলা হয়। কাব্যটিতে মোট বারোটি সর্গে চবিবশটি গান রয়েছে যেগুলির রচনাকালীন রূপ জানা যায় না—গুরুশিষ্য পরম্পরায় বাহিত রূপ বর্তমানে পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের গায়নের দুটি ধারা প্রচলিত ছিল—ধ্রুপদাঙ্গ ধারা ও কীর্তনাঙ্গ ধারা। ধ্রুপদাঙ্গ ধারা গীতগোবিন্দের গানের আদি রীতি। জয়দেব নিজে তাঁর রচিত গানকে

প্রবন্ধ বলেছেন।[২৪ক] নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গীতগোবিন্দের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ সংগীত রাজসভা থেকে শুরু করে মন্দিরের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয় সারা ভারতে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নৃত্যের বিকাশ হয় এর দ্বারা (কুচিপুড়ি, কথাকলি)। উত্তর ভারতে এর সংগীতের প্রাধান্য বেশি—তবে এর ধারাবাহিক প্রচলন উত্তর ভারতে লুপ্তপ্রায় হয়ে এলে মহারাণা কুম্ভ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে এর নব-রূপায়ণ করেন, যা পুনরায় জনপ্রিয় হয়।

গীতগোবিন্দের সঙ্গে বাঙালি তথা বাংলা গানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। বৃন্দাবন ও সন্নিহিত অঞ্চলের সংগীতচর্চায় আদি থেকেই গীতিগোবিন্দের প্রভাব ছিল। এই গান বৈষ্ণবীয় সংগীত ধারার প্রেরণাস্বরূপ। এ ধারা থেকে বাংলাদেশে এক নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটে —পদাবলী ধারা। এরই পাশাপাশি দেখা যায় লৌকিক ধারায় সাধারণ জনসমাজে পূজা-পার্বণ বা কোনো উৎসব উপলক্ষে 'পাঞ্চালিকা' নামক এক বিশিষ্ট রীতিতে নাচ-গান-অভিনয়-বাদ্যর সম্মিলিত আসর বসত সেখানে নাচ-অভিনয়ের পাত্র-পাত্রী হিসাবে পুতুলকে সুতো বেঁধে নাচানো হতো।

এই সময় সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে তিনটি ধারা দেখা যায়:

১. সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে অনুশীলিত অধ্যাত্ম গান।

২. রাজসভাকেন্দ্রিক শিক্ষিত কবিদের পুরাণাশ্রিত কাহিনী, দরবারী ও বৈঠকী গান।

৩. জনসমাজে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যমূলক গেয় আখ্যায়িকা কাব্য, গান।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী জাতির হাতে বাংলার শাসনভার চলে যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়।

চতুর্দশ শতক নাগাদ রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' গীতগোবিন্দের প্রভাব প্রচুর—বিষয় ও গঠন—কাব্যের উভয় দিক থেকেই। রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত নাট্যধর্মী কাব্যটিতে গুর্জ্জরী, কেদার, দেশাগ, ধানুষী, বঙ্গাল, মল্লার, পটমঞ্জরী, বিভাগ, ভৈরবী, শৌরী, শ্রী, পাহাড়ীয়া ইত্যাদি ৩২ টি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে অনেকগুলি রাগ চর্যাপদ ও গীতগোবিন্দ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শাস্ত্রোক্ত রাগ যেমন ব্যবহার হয়েছে তেমনি

আঞ্চলিক রাগের ব্যবহারও রয়েছে। এর অধিকাংশ রাগই আঞ্চলিক রাগ। এতে ব্যবহৃত তালগুলির মধ্যে আছে—ক্রীড়া, রূপক, একতালী, যতি, আটতালা, দত্তক, কুড়ুক ইত্যাদি। কাব্যটির গানগুলিতে ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[২৫] পূর্ববর্তী সংগীতের তুলনায় এ কাব্যের সংগীত অপেক্ষাকৃত জটিল—গমকের (স্বরকম্পন) ব্যবহার পাওয়া যায়। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আসরে দাঁড়িয়ে চটুল প্রকৃতির আদি রসাত্মক এই গানগুলি গাওয়া হতো উক্তি-প্রত্যুক্তির মতো করে। বাংলা গানে ধর্মীয় ভাব ছেড়ে মানবহৃদয়ের স্পন্দন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানেই প্রথম ধ্বনিত হয়। তবে শীঘ্রই তা আবার দৈবীতত্ত্বের আড়ালে চলে যায়।

কাব্যটির প্রায় প্রতিপদেই 'ধ্রু' চিহ্নিত একটি ধ্রুবপদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই '।।১।।' চিহ্নিত স্তবকের পরে ও '।।২।।' চিহ্নিত স্তবকের পূর্বে এই ধ্রুবপদ বর্তমান।

উদাহরণ :

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি
কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি
এ গোট গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর
বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো
আউলাইলো রন্ধন।।১
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি
সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ
নিশিবোঁ আপনা।। ধ্রু

(এই কাব্যাংশটির গায়নরূপটি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হলো)

তুর্কী-বিজয়-পূর্ব বাঙালি জীবনে সাহিত-সংস্কৃতি ছিল মূলত ধর্ম ও রাজসভাকেন্দ্রিক —তুর্কী বিজয়ের ফলে যা কিছুটা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। সূত্রপাত ঘটে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের মতো সাহিত্যধারা। অপরদিকে সূফী প্রচারকদের প্রেমধর্মের হৃদয়ালুতায় দোলা লাগে বাঙালির মনে—প্রয়াস দেখা দেয় রোমান্টিক জাতীয় সাহিত্য রচনার। এই সব মিলিয়ে সংগীতের ক্ষেত্রে ঘটে যায় বিরাট

মা	মা	পা	পা	া	ধপা	মা	পা	পধনর্সা	সা	না	া	নধ	পা
কে	না	০	বাঁ	০	শী০	০	বা	এ০০০	ব	ড়া	০	য়ি০	০
ক্ষানা	ধনা	ধনা	ক্ষা	পা	মা	া	ক্ষ	পা	ধপা	মা	া	সরা	সা
কা০	০০	লি০	নী	০	ন	ই	কৃ	০	০০	লে	০	০০	০
ক্ষ	পা	র্সা	র্সা	া	র্রসা	না	না	র্সা	না	ধা	না	ধপা	া
কে	না	০	বাঁ	০	শী০	০	বা	এ	ব	ড়া	০	য়ি০	০
ধা	ণা	ধা	পা	া	ক্ষা	পা	র্সা	ধা	পা	ক্ষাপা	ধপা	মা	া
এ	০	গো	ঠ	০	গো	০	কু	০	০	লে০	০০	০	০

ইত্যাদি।[২৫ক]

পরিবর্তন। সংগীতের সকল বিভাগ নতুন সৃষ্টি সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আরব ও পারসিক প্রভাবে উত্তর ভারতীয় সংগীত রূপান্তরিত হয়। এই যুগে পেশাদার সংগীতের কদর ও জনপ্রিয়তার চাপে প্রাচীন হিন্দু সংগীত-কিছু লুপ্ত, বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতে পরিণত হয়। বাংলা সংগীতের বিকাশে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বহিরাগত উপাদানকে আঞ্চলিক ভাবগভীরতার সঙ্গে সমন্বিত করে আত্মীকরণের দ্বারা গড়ে উঠেছে বাংলা নিজস্ব গায়ন রীতি—কীর্তন। এর দুটি ধারা—শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী ও শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী। চৈতন্য পূর্ববর্তী ধারায় রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি -চণ্ডীদাসের পদসমূহ। চৈতন্য-পরবর্তীতে পদাবলী কীর্তন, পালাকীর্তন, নগরকীর্তন ও নামকীর্তন মিলে বাংলার বুকে সমুদ্র প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। ফলে একে সুসংহত অবয়ব দেবার প্রয়োজনে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনরোত্তম দাস আহূত খেতুরী মহোৎসবে কীর্তনের চারটি ঘরানার সৃষ্টি হয়—মনোহরশাহী, গরানহাটী, রেনেটি ও মান্দারনী। ঝাড়খণ্ডী নামে পঞ্চম আর একটি ঘরানার উল্লেখও পাওয়া যায়।[২৬]

বাংলা কাব্য সংগীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরবর্তী সংযোজন বৈষ্ণব পদাবলী। পদ বলতে বোঝায় গান বা নাতিদীর্ঘ গেয় রচনা। এই ধারার প্রবর্তক জয়দেব। তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বাংলায় পদ রচিত হয় প্রায় চারশো বছর ধরে (১৫শ-

১৮শ শতাব্দী। বৈষ্ণবপদাবলী পাঠ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় কীর্তনীয়ার কণ্ঠে শুনে শতগুণ আনন্দ লাভ হয়।

বৈষ্ণবদেব প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে পদাবলীর তিনটি যুগ নির্ণিত হয়েছে —প্রাক্-চৈতন্য, চৈতন্যসমকালীন ও চৈতন্যোত্তর।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের প্রধান পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বাঙালি পদকর্তাদের আদর্শ বিদ্যাপাতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে উদ্ভূত এক প্রকার সাংগীতিক ভাষা 'ব্রজবুলি'তে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রায় সকল অনুষঙ্গ অবলম্বনেই পদরচনা করেন। রাজসভার কবি হওয়ায় রাগ ও তাল সমন্বিত তাঁর পদগুলিতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকলেও রাগ-তাল সমন্বিত চণ্ডীদাসের পদ আত্মসমাহিত ধ্যানগম্ভীর, রোমান্টিক। তাঁর কবিতায় ঐশ্বর্য ভাব নেই—আছে ভাবের আন্তরিকতা।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সাংস্কৃতিতে বিপ্লব আনে ও উৎকর্ষতা দান করে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময়ে কীর্তনের প্রচলন থাকলেও চৈতন্যদেবকে বাংলা কীর্তনের জনক বলা হয়। কারণ তিনিই প্রথম কীর্তনকে ব্যাপকভাবে গেয় বিষয়ে পরিণত করেন। তিনি নাম কীর্তন ও নগর কীর্তনের প্রবর্তক। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কীর্তনের মাধ্যমে শুধু ভাব বিপ্লবই সাধিত হয়নি সংগীত বিপ্লব ও সাধিত হয়েছিল। তাঁর প্রবর্তিত কীর্তনে রাগরাগিণীর ও বিভিন্ন তালের ব্যবহার দেখা যায় যার মধ্যে বেশীরভাগই দেশীয়। সে-অর্থে কীর্তনকে বাংলার জাতীয় সংগীত বলা যায়। বাঙালির একান্ত নিজস্ব স্বকীয় প্রতিভা থেকে এর উদ্ভব ও পরিপুষ্টি। এর ভক্তির দিকটির সঙ্গে সুরের একটি বিশেষ আবেদন আছে। কীর্তন নিষ্পন্ন হয়েছে কৃৎ ধাতু থেকে যার অর্থ প্রশংসা। আবার কীর্তন শব্দের সাধারণ অর্থ কথন, বচন, বর্ণন, ঘোষণা। সব মিলিয়ে বলা যায়, রূপে-গুণে-জ্ঞানে-কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম, গুণ ইত্যাদি স্মরণ বর্ণনের মাধ্যমে যশোগাথা করা বা যশোসূচক গানকে কীর্তন বলে।[২৭]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের নাম গান বা স্তুতিগানের প্রচলন ছিল। ভক্তিসাধনার নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে কীর্তনের প্রতিষ্ঠা হয় আরও পরে। দাক্ষিণাত্যে তামিলনাড়ু ও কেরলের আড়বার সন্তরা (আনুমানিক ষষ্ঠ-নবম শতাব্দী) বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের নামগুণলীলা বিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট ভজন সংগীত রচনা করেছিলেন এবং মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থানে গানগুলি গেয়ে উপাসনা করতেন—দাক্ষিণাত্যে এই পদ্ধতির

খুব প্রসার হয়। ভজন একক সংগীত, কিন্তু বহু লোক একজায়গায় বসে তা শুনত। ধীরে ধীরে তারাও এতে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করে—প্রচার হয় ভজন-কীর্তনের।

চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতক এই তিনশো বছর ভারতে ভক্তিধর্মের জোয়ারের ফলে ভজন কীর্তন পদ্ধতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।[২৮] চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে 'পদগান' নামক একপ্রকার গান প্রচলিত ছিল যা আদতে ছিল বিষ্ণুর স্তুতিবাচক একপ্রকার ভজন জাতীয় গান। এ গান আলাপবিহীন, অলংকার-বর্জিত সাদামাটা ধ্রুপদ গানের মতো ছিল। এগুলি বাংলায় রচিত হলেও এতে মৈথিলী প্রভাব ছিল প্রচুর। হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর 'বাংলা কীর্তনের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

> পদগান আসলে বৈঠকী গান, প্রবন্ধ সঙ্গীত। চৈতন্যমণ্ডলীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদগান হইত।.....প্রকাশ্যে পদগান করার প্রথা পাকাপাকিভাবে চালু করিলেন নরোত্তমদাস।.....খেতুরীতে লীলাকীর্তন উপলক্ষে পদগান সর্বজন সমক্ষে আসিয়া গেল।'[২৯]

পরবর্তীকালে এই পদগান রূপান্তরিত হয়ে স্থান করে নেয় লীলাকীর্তন বা পদাবলী কীর্তনে। এগুলি ছিল প্রকীর্ণ গান — অর্থাৎ লোকগীত ও শাস্ত্রীয় গীতের এক মাঝামাঝি অবস্থানে। আবার অন্যদিকে প্রাচীন আলংকারিকেরা মনে করেন চর্যাযুগ থেকে প্রবন্ধ গীতির মধ্য দিয়ে কীর্তনের প্রকাশ ঘটেছে। যদিও চর্যাপদগুলিও সাধন সংগীত, একক বা সম্মিলিত ভাবে গাওয়া হতো তবু এগুলি ঠিক কীর্তন নয়। কারণ এগুলিতে সাধনার গূঢ় পদ্ধতি ও তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কীর্তনের ভাব-বিহ্বলতা পাওয়া যায় না। আর কীর্তন হলো হীতেশরঞ্জনের মতে, নাম-গুণ-লীলা বর্ণনামূলক ভাববিহ্বল সাধনসংগীত।

পদাবলীকীর্তন তিন প্রকার—নামকীর্তন, রসকীর্তন এবং লীলাকীর্তন। নামকীর্তন হলো নৃত্য সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান করা। রসকীর্তনে বৃন্দাবন লীলার বিভিন্ন অধ্যায়ের একই প্রকার রস নিয়ে কীর্তন গাওয়া হয়। কখনও আবার দু'তিনটি রসের একত্র সমাবেশ ঘটে। আবার লীলাকীর্তন হলো একটি অধ্যায়ের লীলার গান বা একই প্রকৃতির লীলার গান। যদি বিভিন্ন স্থান থেকে একই প্রকৃতির রস পরিবেশন দ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ গীত

সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়, অথবা লীলার বিভিন্ন পদের একত্র সমাবেশ ঘটে তবে তাকে পালাকীর্তন বলে। আবার রসকীর্তন বা লীলাকীর্তন যখন বিভিন্ন পদকর্তার পদ একত্র গ্রথিত করে গীত হয়, তখন তাকে পদাবলী কীর্তন বলে।[৩০] এতে সর্বত্রই সময়োচিত রাগের ব্যবহার হয়।পালাকীর্তন রাধাকৃষ্ণর লীলা বিষয়ক ভাবময় গান। এতে কাব্য ও সুর পরস্পরের পরিপূরক।

চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) আবির্ভাবের পূর্বেও কীর্তন প্রচলিত ছিল। প্রায় জনশ্রুতি থেকেই আমরা জানি যে, তবুও তাঁকেই কীর্তনের প্রবর্তক বলা হয়, কারণ বাংলায় উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে কীর্তন ও সংকীর্তনের বিশিষ্ট রূপ তিনিই দেন।[৩১]

সকলে মিলে গাওয়া হয় বলে এই কীর্তনকে সংকীর্তন বলে। আচণ্ডাল সকল জাতির মানুষ মিলিত হয়ে বাদ্য সহযোগে প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে নাচ-গান করে ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠত—অর্থাৎ এটি সমন্বয়ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। চর্যাপদও সাধনসংগীত, কিন্তু সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। গীতগোবিন্দ প্রথমে রাজদরবারে পরে মন্দিরে পরিবেশিত হতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের একটা আভাস পাওয়া যায়। পদাবলী কীর্তনে তার বিকাশ ঘটে ও চৈতন্য-সমকাল ও পরবর্তী কীর্তন গানে পূর্ণরূপে পরিণতি লাভ করে। নবদ্বীপের পথে পথে প্রকাশ্যে পরিভ্রমণ করে বাদ্য-গান-নাচ সহযোগে নগরসংকীর্তন গাওয়ার কথাও জানা যায়। বস্তুত শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারান্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এই সামূহিক সংকীর্তনের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। প্রচারের হাতিয়াররূপে সংগীতের এই ব্যবহার আমাদের চমৎকৃত করে।[৩২] লীলাকীর্তন ভাবময় সংগীত। এখানে কথা ও সুর পরস্পরের পরিপূরক। এই গানের পাঁচটি অংশ—কথা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমর। বিভিন্ন কবির লেখা পদ নিয়ে লীলাকীর্তন গাওয়া হয়। একাধিক পদের সংযোগ রক্ষা করার জন্য বা দুরূহ পদকে সরলীকৃত করার জন্য বা নায়ক-নায়িকা-দূতী-সখী-সখার উক্তি প্রত্যুক্তি ব্যাখ্যার জন্য কীর্তনীয়ারা স্বরচিত বাক্যে যা শোনান তা হল কথা। আখর দ্বারা কীর্তনের মূল বক্তব্য সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যা এসেছে হিন্দুস্থানী সংগীত ঠুংরী ও ভজন থেকে, এই প্রথা আগে ছিল না। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার কীর্তন ও কীর্তনিয়া' গ্রন্থে জানিয়েছেন —'আখর পদাবলী-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসভাণ্ডারের কুলুপ খুলিবার কুঞ্চিকা।'

কথার তুক ও ছুটের চেয়ে আখরের ভূমিকা কীর্তনে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। পদে যা বলা হয় না তা আখরে প্রকাশ পায়। কীর্তনে কতগুলি বাঁধা আখর প্রচলিত আছে, এছাড়া কীর্তনীয়ারা আখর তৈরিও করে নেন। বিশেষ বিশেষ পদের মাঝখানে 'অনুপ্রাস বহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক' যে গাথা গাওয়া হয় তাকে বলে তুক। তুককে পদ্যে রচিত আখরও বলা যায়। ছুট হল হাল্কা ধরনের গান। ভারি ও মহাজনী পদ গাইতে গাইতে কীর্তনীয়া দ্বারা একটু সহজভাবে কোনো পদের অংশবিশেষ গাওয়াকে বলে ছুট। কীর্তনের পঞ্চ ম অংশ ঝুমর। সাধারণত লীলকীর্তন শেষ করা হয় রাধাকৃষ্ণের মিলনগান গেয়ে। কিন্তু কখনও কখনও একাধিক কীর্তনীয়া একই আসরে একই রস পর্যায়ের গান গাইলে তখন মিলনাত্মক গান গেয়ে কীর্তনের শেষ গায়ক কীর্তনের সমাপ্তি ঘটান। আর পূর্ববর্তী কীর্তনীয়ারা মিলন গান না গেয়ে গান ঝুমর। ঝুমর বলতে তখন বোঝায় সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতলয়ে গেয় এমন পদ যা মিলনের পরিবর্তে গেয়ে পালা এগিয়ে নিয়ে যান পরবর্তী কীর্তনের দিকে। এছাড়া কীর্তনে কিছু শ্লোকভঙ্গিম রচনা পদকাররা আবৃত্তি করে থাকেন মূল সুরকে অনুসরণ করে, একে বলে দোহা।[৩৩]

মূলত পাঁচজনকে নিয়ে কীর্তন গানের দল গঠিত হয়—যার মধ্যে মূল গায়ক একজন, যিনি দলের মুখ্য। এছাড়া মূল গায়কের উভয় পাশে একজন করে সহায়ক গায়ক ও বাদক থাকেন। দোহারা মূল গায়ককে গান গেয়ে সহায়তা করেন, গানের সূত্র ধরিয়ে দেন এবং আসরে সুরের রেশ জমিয়ে রাখেন। লীলাকীর্তনে কৃষ্ণলীলা গাইবার আগে গৌরচন্দ্রিকা গাইতে হয়।

খেতুরী মহোৎসবের পর কীর্তনের যে পাঁচটি ঘরানা গড়ে ওঠে তাদের উপর হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রভাব পড়েছিল। লীলাকীর্তনের আদি ধারা গড়েরহাটী বা গরাণহাটীতে ধ্রুপদের প্রভাব, ১০৮ প্রকার তালের ব্যবহার ছিল। গরাণহাটী থেকে উদ্ভব হয় মুখ্যধারা মনোহরসাহী ঘরানার যাতে খেয়ালের প্রভাব পড়ে ও ৫৪টি তালে গীত হতো এই কীর্তন। বর্তমানে লীলাকীর্তন বলতে মনোহরশাহী ঘরানার কীর্তনই প্রচলিত আছে, এই ধারাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়। কীর্তনের তৃতীয় ধারা হলো রেনেটী বা রাণীহাটী ধারা। অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়, মাধুর্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরপুর এই ধারাতে ঠুংরীর প্রভাব পড়েছে এবং এটি গাওয়া হতো ২৬ প্রকার তালে। চতুর্থ ধারার নাম মান্দারনী। রাঢ় অঞ্চ লের মঙ্গলগানের বা পাঁচালির সুর ভেঙে গঠিত এই ধারায় ৯টি তাল ব্যবহৃত

হতো। ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীত ঝুমুর গানের প্রভাবে গঠিত হয় ঝাড়খণ্ডী নামক পঞ্চম ধারা। কীর্তনের বাদ্যযন্ত্র ছিল একেবারে বাংলার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র—খোল, করতাল, ঝাঁঝ (কাঁসর), খমক ও খঞ্জরী। কীর্তনে এত প্রকার তালের ব্যবহার ছিল যার মধ্যে বেশিরভাগ তার নিজস্ব তাল—এছাড়া উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালও ব্যবহৃত হতো। কীর্তনের কয়েকটি প্রচলিত তাল রূপক, ঝাঁপতাল, তেওরা, ধামালি, আড়াঠেকা, লোফা, পিয়ারী ইত্যাদি। পদাবলী কীর্তনই বাংলা কাব্যসংগীতের প্রথম সার্থক প্রয়াস বলা হয়।

কীর্তনের সমসাময়িক সময়ে মঙ্গলকাব্যের (১৫শ-১৮শ শতাব্দী) একটি ধারা গড়ে ওঠে যাকে মঙ্গলগীতি বলা হয়। খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকেই মঙ্গলগীত প্রচলিত ছিল। মঙ্গলকামনায় যে গীত গাওয়া হয় তাই মঙ্গলগীত—যার আভাস আদিমযুগ থেকেই পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, ভরতের নাট্যশাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রারম্ভে গাওয়া হত মঙ্গলগীত। পাল ও সেনযুগে এগুলি নতুন ভাবে রূপায়িত হয় দেশীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতি মিলন ঘটে এবং পরবর্তীকালে তারই বিবর্তিত রূপ মঙ্গলকাব্যর বিকাশ হয়। বিবাহ, ব্রতপালন, পূজাচার ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গীত গানকেও মঙ্গলগীত বলা হয়। মঙ্গলগীত হলো বাংলার নিজস্ব সম্পদ। অনেকে মনে করেন মঙ্গ ল রাগ থেকে যে গানের জন্ম তাকে মঙ্গলগীত বলে। কিন্তু দেখা গেছে মঙ্গল রাগ ছাড়াও এ গানে অন্যান্য রাগ ব্যবহৃত হতো।[৩৪]

মঙ্গলকাব্যের গায়নরীতি ছিল খুবই সহজ, ফলে বেশীরভাগেরই কোন সাংগীতিক মাত্রা ছিল না। এই সংগীতে গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত রাগসমূহের ব্যবহার দেখা যায় বসন্ত, মল্লার শ্রীরাগ ইত্যাদি। তবে রাগসাংগীতিক পদ্ধতিতে নয়। কারণ মঙ্গলগীতের পদগুলি অতি দীর্ঘ প্রকৃতির ছিল, ফলে এতে একটি রাগের স্বরকাঠামোয় পুনরাবৃত্তিমূলক সুর ব্যবহার হতো। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন :

> মঙ্গলকাব্যের অতিবিস্তৃত পদাবলী কিভাবে বড় বড় রাগে গাওয়া হত। এর তো স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নেই। তবে মল্লার, বসন্ত, শ্রীরাগ এইসব রাগের ব্যবহার পদাবলীতে কি ভাবে হত? এরএকমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এই সব রাগের কাঠামোটুকুই আবৃত্তির স্বরে রক্ষিত হত আর কিছু নয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আঙ্গিক মঙ্গলকাব্যের গায়ন পদ্ধতিতে অবলম্বন করার সুযোগ ছিল না।[৩৫]

মঙ্গলগীতের সমগ্র রচনাকে কয়েকটি পালায় বিভক্ত করে গাওয়া হতো। এতে থাকেন

মুখ্য গায়ক ও দোহার সম্প্রদায়। মন্দিরা, খমক, শঙ্খ, খোল, করতাল ইত্যাদি সহযোগে পূর্ববর্তী সংগীত পরিবেশনের রীতি অনুযায়ী এই সংগীত পরিবেশিত হতো। ঈশ্বর বন্দনা করে মূল গায়েন ধুয়ো ধরেন, দোহাররা সেই ধুয়োর পুনরাবৃত্তি করেন। ক্রমে লয় বৃদ্ধি করে সেটি বারবার গেয়ে মূল গায়েন মঙ্গলকাব্য থেকে আবৃত্তি শুরু করেন তাল রক্ষা করে, বাদ্যযন্ত্রও ধীরে বা নিম্নস্বরে বাজতে থাকে। কোনো অধ্যায় শেষ হলে প্রারম্ভিক ধুয়ো বারবার গাওয়া হয়। নতুন অধ্যায় শুরু করলে নতুন ধুয়োর প্রবর্তন করা হয়।

বাংলার নিজস্ব কাব্যসংগীত মঙ্গল-গানে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনীকে অবলম্বন করে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হতো। ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) নিজের রচনায় দৈবী কাহিনীকে ক্ষয়িষ্ণু করে মানবেকিন্দ্রক নানা লক্ষণকে স্পষ্ট করে তোলেন যা পরবর্তী মানবিক প্রেমসংগীত রচনার পটভূমি গঠনে সাহায্য করে। রাগ-তাল সমন্বিত তাঁর গান 'দরবারী সংগীতের উচ্চাভিলাষী জৌলুসপূর্ণ' হওয়ায় তাতে সাধারণের আর অবাধ প্রবেশাধিকার থাকল না—সেই সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যুগও শেষ হয়ে গেল। এই সময় অনুবাদ সাহিত্যের ধারা, পাঁচালি ইত্যাদি প্রচলন দেখা গেল। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, দেব-দেবীর পাঁচালি, ব্রতকথা পাঁচালি, সত্যপীরের গান, গোরক্ষবিজয়—ইত্যাদি বেশিরভাগই একঘেয়ে পাঁচালির সুরে গাওয়া হতো। এই পাঁচালির সুরের কাঠামোর উদাহরণ এইভাবে উল্লিখিত হতে পারে :

সা	গা	রা	সা	সা	সা	ণ্া	ণ্া	সা	গা	রা	সা	সা	৷	৷	৷
পা	পা	পা	ধা	মা	পা	মা	গা	রা	জ্ঞা	রা	সা	সা	৷	৷	৷
সা	গা	গা	গা	মা	পা	পা	ধা	মা	পা	ধা	পা	মপা	ধপা	মা	গা
গা	পা	মা	পা	গা	মা	রা	গা	সা	রা	রা	গা	গা	৷	৷	৷

ইত্যাদি।[৩৬]

তবে কথক শ্রেণীর পেশাদার পাঠক বা গায়করা এতে বৈচিত্র্য আনেন।পাঁচালির গানে একটু অভিনয়ের ঢঙ থাকে। পরবর্তী সময়ে দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) পাঁচালিকে বিশিষ্টতা দান করেন।

পদাবলী সংগীতে শেষ সংযোজন শাক্ত পদাবলী (১৮শ- ১৯শ শতাব্দী) এই সময়ের আরেকটি প্রধান ধারা। এর মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয় যার বৈশিষ্ট্য মানবিক আবেদন। এই সংগীতে আরাধ্য শক্তিদেবীকে মানবীকৃত করে তোলা হয়েছে। রাগসংগীত ও লোকসংগীতের মিশ্রণে গঠিত এ সংগীতের সুর সরল কিন্তু ভাবগম্ভীর। এ ধারার সংগীতের দুটি ভাগ—উমা সংগীত ও শ্যামা সংগীত। উমা সংগীতের আবার দুটি পর্যায়—আগমনী ও বিজয়া। উমা সংগীতে দেবী ঘরের মেয়ে এবং শ্যামাসংগীতে দেবীর জগজননী রূপ প্রকাশিত। শাক্ত সংগীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ (১৭২০-১৭৮১) উভয় ধারার স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট 'প্রসাদী সংগীতে'র মতো এত সহজ সরল আবেদন অপর কোনো কবির গানে পাওয়া যায় না।

রাগসুর ও বাউলের মিশ্রণে প্রসাদীসুরের কাঠামো গঠিত। সহজ-সরল-ভাবগভীর ও ব্যঞ্জনাময় এই সুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, শুধু সমকালেই নয়, পরবর্তীকালেও যা ছিল অক্ষুণ্ণ—ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছিল। ঈষৎ দ্রুত একতালে গ্রথিত, স্থায়ী ও অন্তরায় গঠিত সুরটি কাঠামো মোটামুটি এইরকম :

স্থায়ী

গম পম গা। রা সা রা। গা গঃমগঃ রগা। মা পা ।।
পা ধা র্সা। র্সা র্সা ।। নর্সা । র্সা। র্সা না ধা।
ধা নর্সা র্রা। । র্সা না। ধা । পা। মা পা ।।

অন্তরা

। । পা। ধা ধা ধা। র্সা । র্সা । না ধা পা।
। । না। না র্সা র্রা। র্সা । র্সা । র্সা র্সা ।।
। । র্সা। র্গা র্মা র্গা। র্রা । র্রা । র্রা সর্রা র্গর্মা
র্গর্রা র্সার্সা ধা। না র্সা র্রা। র্সা । র্সা । র্সা র্সা র্সা।
পা । র্সা। র্সা র্সা ।। র্সা । র্সা । র্সা না ধা।
ধা । নর্সা। র্রা র্সা ন। ধা পা পা । মা পা গ। ৩৭

—এই কাঠামোটিকে গানে ব্যবহার করার সময় কথা ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন কখনেও কখনও করেছেন রামপ্রসাদ। বিষয় ও কাব্যগুণের

সম্পন্নতায় তাঁর গান আজও জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথও রামপ্রসাদী সুর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং সুরমিশ্রণের প্রক্রিয়াকে ব্যাপকতা, গভীরতা ও ব্যঞ্জনা দান করেন।

উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় শাক্তসংগীত রচয়িতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১)। তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। তাই তাঁর রচিত গানের ছন্দ-মাধুরীতে শ্রুতিমধুর শব্দঝংকার যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় সংগীত শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী মনের ভাববাহী সুর মাধুর্য। তিনি শাক্তসংগীতের ধারায় সংগীত রচনায় বিভিন্ন শৈলী বা ফর্ম ব্যবহার করেছেন—প্রসাদী সুরে যেমন সংগীত রচনা করেছেন, তেমনি টপ্পাঙ্গে, খেয়ালাঙ্গেও বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। তাঁর গান বহুলাংশে কাব্য ও সংগীত সৌকর্যে হৃদয়গ্রাহী। টপ্পাঙ্গের সংগীত রচনায় কালী মির্জার (আনু. ১৭৫০-১৮২০) দ্বারা এবং খেয়ালাঙ্গ সংগীত রচনায় দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন বলে মনে হয়। এই তিনজনই বর্ধমান রাজসভার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে যুক্ত ছিলেন।

এই ধারায় অপর একজন বিশিষ্ট রচয়িতা দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) একাধারে সংগীত রচয়িতা ও গায়ক হিসাবে খ্যাত। তাঁকে চারতুকের বাংলা খেয়াল গানের আদি রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। খেয়াল সাধারণত দুই তুকের হলেও চারতুকের খেয়ালও পাওয়া যায়। এই চারতুকের খেয়ালের কাঠামো রঘুনাথ রায় ব্যবহার করেছেন। যাঁরা শাক্তসংগীত রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কবিয়াল, পাঁচালিকার, কৃষ্ণযাত্রার গায়ক প্রমুখ যেমন আছেন, তেমনি আছেন রাজা বা রাজকর্মচারীগণ। উল্লেখযোগ্য এই যে, কালী মির্জা টপ্পাঙ্গের শ্যামাসংগীত রচনা করে ভক্তিসংগীতে টপ্পার যোগসূত্র স্থাপন করেন। যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই পরবর্তীতে এই ধরনের গান রচনা করেছেন। শাক্ত সংগীত সাধনসংগীত হলেও শাক্ত সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—গণ্ডীমুক্ত হয়েছিল অনেকটাই।[৩৮]

এরপরেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা গানের স্রোতধারায় দুটি স্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়—একটি গ্রামকেন্দ্রিক, অন্যটি নগরকেন্দ্রিক। এই দুই ধারাতেই শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ গড়ে ওঠে। অখণ্ড বাঙালি জীবনে গ্রাম-নগরের বিভাজনের শুরু হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সময় যখন ভূমি-নির্ভর গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বদলে রাষ্ট্রায়ত্ত মুদ্রা-নির্ভর নতুন অর্থনৈতিক জীবন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। মুঘল-নগরীর অর্থ সঞ্চয়ের

ব্যাকুলতা, নারী-লোলুপতা বাঙালির জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে—এদের শরীর মনকে করে তোলে জীর্ণ। শোষণ সংক্রান্ত মানসিকতার প্রাধান্য, মানসিক মূল্যাবোধের অবক্ষয়, সুস্থ চিন্তার অভাব ঘটতে থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যের এই ঐতিহ্যকে বহন করে এদেশে ঘটে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা। এর প্রথম ধাপে এই বিনষ্টির ধারা আরও ব্যাপক ও দ্রুত হয়ে ওঠে।

মনে করা যেতে পারে যে, এই পর্বেই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে সাহিত্যের আদর্শ গতানুগতিকতায় রুদ্ধ হয়েছিল। নতুন ধরনের প্রেমকবিতার সৃষ্টি হয়েছিল, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবিতার থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের প্রণয় সংগীত। তার সঙ্গেই এসেছিল হিন্দুস্থানী গান ভেঙে বাংলা টপ্পা। এসব কবিতা বা গানে চকিত কবিত্বের আভাস থকলেও এই কাব্য বাঙালির বলিষ্ঠ হৃদয়বত্তার পরিচয় দেয় না। এইসব গানের ভাবাতিরেক কখনও কখনও মনোহারি কিন্তু বহুলাংশে পৌরুষহীন ছলাকলায় পর্যবসিত।এমন এক সময়ে এদের জন্ম ও বিকাশ যে সময় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির মতোই বদ্ধ ও দূষিত।[৩৯]

তবে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত, প্রাধান্য ও ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসায় বাঙালির জীবন-মননে ঘটে বিরাট পরিবর্তন। দীর্ঘদিনের ধবংসের গ্লানি-ক্ষোভ, তার থেকে মুক্তির দুর্বার আকঙ্ক্ষা আশ্রয় বা অবলম্বন হিসাবে পেয়েছিল ফরাসি বিপ্লব-প্রভাবিত পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে—ফলে ঘটে যায় ব্যাহত-বিকশিত ও বিকলাঙ্গ হলেও এক-ধরনের নবজাগরণ।

এই সময়ের সংগীতের প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কবিগানের বা কবিওয়ালাদের গানের।[৪০]দু-জন বা দু'দল কবিওয়ালার মধ্যে গীত উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক (প্রায়শই তা আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক মুখজবানীমূলক) এই গানে সুরপ্রয়োগের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলী থেকে মূল বিষয় গ্রহণ করে এ গান আবর্তিত হতো দেব-দেবীর প্রসঙ্গ, মানবীয় প্রেম, সামাজিক সমস্যা, যৌন বিষয়ক কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত, পৌরাণিক উপাখ্যান সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।[৪১]

বৃহত্তর ভারতবর্ষের সংগীতের সঙ্গে বাংলা গানের সম্পর্ক-সূত্রটি নিরূপণের পূর্বেই আমরা বাংলা কাব্য-সংগীতের নিরিখে একাধারে সাফল্য ও সীমাবদ্ধতায় স্থিত কবিগানের ভূমিকাটি দেখে নিতে পারি।

কবিগানের উৎস নিয়ে মতভেদ প্রচুর। কারও মতে যাত্রাগান থেকে কবিগানের জন্ম, কারও মতে পাঁচালি থেকে, কারও মতে ঝুমুর গান থেকে। আবার কারও মতে খেউড় নামক অশ্লীল যৌন-বিষয়ক গান হলো কবিগানের পূর্বরূপ। যাই হোক, বিতর্কের বাইরে বেরিয়ে বলা যায় যে, কবিগানের মধ্যে উপরোক্ত পদ্ধতির গানের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু দেখা যায় যার ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি। যে-কোনো নতুন সৃষ্টি আকস্মিকভাবে জন্মাতে পারে না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন তার পূর্বের কোন প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অনুপ্রেরণার কাজ করে, তেমনি পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার জন্য তাকে বিভিন্ন জায়গা, প্রসঙ্গ, পদ্ধতি, শৈলী ইত্যাদি থেকে উপাদান গ্রহণ করতে হয়। কবিগানও তেমনি বিভিন্ন ধরনের গানের রীতি নিয়ে তার নিজস্ব রূপ ও শৈলী গড়ে তুলেছে বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বৈদিক সাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব, রহস্যবাদী তত্ত্বব্যাখ্যা প্রশ্ন ও উত্তর রীতিতে করা হতো, তবে গীত-বর্জিত অবস্থায়—একে 'বাকোবাক্য' রীতি বলা হয়। এরই পাশাপাশি প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ঢোল-কাঁসির সহযোগে ছড়া কেটে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গাথা বা আর্য্যা বা তর্জা গানে অধ্যাত্ম বা অন্য বিষয়ক প্রহেলিকার ব্যাখ্যা করা হতো। মধ্যযুগে প্রচলিত সংলাপধর্মী বা প্রশ্নোত্তরমূলক নৃত্যগীতযুক্ত ঝুমুর গানের চারটি পর্যায় পাওয়া যায়—১. সখীসংবাদ (ব্রজলীলা), ২. আগম (ভবানী বিষয়ক), ৩. লহর (শ্লেষ ও ব্যঙ্গ), ৪. খেউড় (অশ্লীল গান)।[৪২] 'খেউড়' বা 'খেঁউড়' (ঞ 'খেঁড়ু') অশ্লীল যৌন-বিষয়ক গান যা থেকে কবিগান বিকশিত বলে মনে করা হয়। এ গান প্রথমে ছিল :

> অবরুদ্ধ মেয়ে মহলে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গেয়, পুরুষের শ্রবণ-অযোগ্য, কুৎসিত ভাব-ভাষার গান। তাহার পরে এই ধরনের গান অমার্জিত বিকৃতরুচি পুরুষ সমাজেও প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা কবিগানের এক পূর্বরূপ।[৪৩]

প্রাথমিক অবস্থায় খেউড় গানের রূপ যাই থাক বিকশিত খেউড় গানের রূপ ছিল কিছুটা তর্জা গানের মতো—তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে গান জমে উঠত। সহজ সরল সুর ও কয়েকটি সহজ তাল ও রাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হাল্কা চালের এ গানে ভাব ও ভাষায়

মার্জিত রুচির অভাব ছিল। এ-গান অশিক্ষিত ও অমার্জিত লোকসমাজে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সবমিলিয়ে বলা যায়—প্রাচীনত্বের দিক থেকে দেখলে বলতে হয় প্রাচীন তর্জা গানের সঙ্গে ঝুমুর গানের মিশ্রণে কবিগানের প্রাথমিক রূপ গঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বা তার কিছু আগে—তবে সে সময়ে কবিগানের পরবর্তীকালীন চারটি পর্যায় ছিল না, এ ছিল গ্রাম্য কবিগান। এরপর এর বিকাশ ঘটে তৎকালীন প্রচলিত জনপ্রিয় বিভিন্ন প্রকার সংগীত থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে।

রাঢ় অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকসংগীত ঝুমুর গান প্রভাবিত কবিগানের জন্ম রাঢ় অঞ্চলে বলে মনে করেন অনেকে। একথা সত্যি হলে বলা যায়, রাঢ়ের গ্রাম্য কবিগান নিজের বিকাশ ঘটায় নদীয়ার উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে, নদীয়ার বৈষ্ণব-পরিমণ্ডলের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ বিষয়, জনসাধারণের কাছ বিশেষ উপভোগ্য খেউড় গান উপাদান হিসাবে গ্রহণের পাশাপাশি প্রচলিত ও জনপ্রিয় শাক্ত বিষয়ক মালসী বা ভবানী বিষয়কেও গ্রহণ করে গড়ে তোলে পূর্ণাঙ্গ রূপ যার বিষয়গত চারটি পর্যায় ছিল — ১. গুরুদেবের গীত (গুরুবন্দনা ও গুরুপ্রসাদ প্রার্থনা), ২. সখীসংবাদ (নায়ক-নায়িকার গোপন অভিসার ও মিলন বিষয়ক), ৩. বিরহ (নায়িকার বিলাপ-বিষয়ক), ৪. খেউড় (নায়ক নায়িকার মিলন বিষয়ক যৌন আবেদনমূলক অংশ)।[৪৪] এই পর্যায় অনুসরণ করে প্রধানত দু'দলের মধ্যে কবিগানের লড়াই চলত। একদলের প্রধান কবিয়াল গানের মাধ্যমে প্রত্যেক পর্যায় অনুযায়ী চাপান (প্রশ্ন) দিতেন অপর দলপ্রধান তার উতোর (উত্তর) দিতেন। দলের অন্যান্যরা প্রধান কবিয়ালকে অনুসরণ করতেন। এভাবে চাপান-উতোরে যে দল সফল হতো বা বেশি ভালো বলে বিবেচিত হতো তাদের জয়ী হিসাবে ধরা হতো এবং জয়ী দল প্রচুর টাকা পয়সা উপহার পেত। প্রথম দিকে কবিগান করার আগে দুই প্রতিপক্ষ দল মিলিত হয়ে বিতর্কের বিষয় ঠিক করে চাপান ও উত্তোর পর-পর রচনা করে নিত এবং আসরে পূর্ব-প্রস্তুত গান পরিবেশন করত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে আসরেই তৎক্ষণাৎ চাপান ও উতোর রচনা করে গাইবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।[৪৫] একাধিক শতক ধরে কবিগানের গঠন-বিকাশের প্রক্রিয়া চললেও এই গান জনপ্রিয়তা অর্জন করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত। বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু—এই সময়সীমার মধ্যে কবিগানের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বলাই বাহুল্য কাব্যসংগীতের মাপকাঠিতে কবিগানে উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বেশি, কাব্যত্ব ছিল ন্যূন। তার কারণটি সহজেই অনুমেয়। কবিগানের স্রষ্টারা সকলেই ছিলেন পেশাদার। এবং পেশার কারণেই মার্জনাহীন পৃষ্ঠপোষকদের কথা মনে রেখেই[৪৬] তাঁদের গানের কথাকে যমক-অনুপ্রাস-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপসংকুল করে তুলতে হতো। এঁরা কবি নন, বহুলাংশে ছিলেন কবিওয়ালা।

রবীন্দ্রনাথ কবিগানে মধ্যে ভাবের খামতি, ভাষার ব্যভিচার, সৌন্দর্যবোধের অভাব, ছন্দ-পারিপাট্যের ঘাটতি, ব্যাকরণের অনাচার, সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকারের অতিচার, বিকৃত ও দূষণীয় রুচির ইতরতা ও নৈরাজ্য—ইত্যাদি অপগুণ লক্ষ্য করেছিলেন।[৪৭]

কাব্য হিসেবে কবিওয়ালাদের গানের ন্যূনতা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যসংগীতের পরম্পরায়িত ইতিহাসযাত্রায় কবি-সংগীতের ভূমিকাটি অবশ্যস্বীকার্য। 'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান।'—রবীন্দ্রনাথের নির্ণয়টি এ-ক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

মধ্যযুগের বাংলা গানের আলোচনার পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই যুগে মুসলমান প্রভাবে উত্তর ভারতীয় সংগীতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ও নব-নব রূপের প্রতিষ্ঠা ঘটে তা পরবর্তীকালে বাংলাগানের রূপ গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রচলিত রাগসংগীত পদ্ধতির চারটি প্রধান ধারা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর মধ্যে ধ্রুপদ হল প্রাচীনতম, শ্রেষ্ঠতম ও শুদ্ধতম ভারতীয় হিন্দুসংগীতের ধারা যা মুসলমান-পূর্ব যুগের সালগসূড় প্রবন্ধ-সংগীত থেকে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পায় মুসলিম যুগে। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু শাস্ত্রীয়-সংগীত বিবর্তিত হয় হিন্দুস্থানী সংগীতে। এই সময় রাগের পূর্ণ বিকাশ হয়, ঠাটের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়, বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তনসাধন করা হয়, উদ্ভব হয় ঘরানার।

মুসলিম যুগে ভারতীয় সংগীতের নতুন অধ্যায় সূচনা করেন আমীর খসরু (১২৫৩/৫৪ -১৩২৫ খ্রী.)। ইনি ভারতীয় হিন্দুসংগীতের সঙ্গে পারস্যের সংগীত মিশ্রণে ভারতীয় সংগীতের উন্নতি ঘটান ও নতুনত্ব আনেন এবং হিন্দু সংগীতকে হিন্দুস্থানী সংগীতে

বিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করেন। হিন্দু প্রবন্ধ সংগীত ও পারসিক সংগীত রীতির মিশ্রণে 'কওল' নামক একপ্রকার মুসলিম অভিজাত সংগীত প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'কওল' বা 'কবালী' গান ভারতে পূর্ব প্রচলিত দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যাযাবর সম্প্রদায় দ্বারা গীত ভক্তিমূলক কবালী গান থেকে পৃথক ছিল। খসরু প্রবর্তিত এই কওল গান খেয়াল গানের আদিরূপ বলে মনে করা হয়। এগুলি ছিল মূলত প্রেম-বিষয়ক এবং মধ্যম ও দ্রুত লয়ে গীত সাধারণত দুই তুক বিশিষ্ট গীতবন্ধ। পঞ্চ দশ শতকের মধ্যভাগে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কি এই গীতরূপের সংস্কার সাধন করে বিলম্বিত লয়ে খেয়াল পরিবেশনরীতির সূচনা করেন খসরুর মূল কাঠামো বজায় রেখে শুদ্ধ খেয়াল নামে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহর (১৭১৯ - ১৭৪৮ খ্রী.) সভা-সংগীতজ্ঞ ধ্রুপদ ধমারের উচ্চস্তরের গায়ক সদারঙ্গ খসরু প্রবর্তিত দ্রুতলয়ের খেয়ালের সঙ্গে ধ্রুপদের বিলম্বিত লয়ের সমন্বয় সাধন ও অলংকার প্রয়োগ করে গড়ে তোলেন খেয়ালের নতুন রূপ যা আজও বেশিরভাগটাই অনুসৃত হয়।[৪৮] আমীর খুসরু কওল, খেয়াল রীতির প্রবক্তাই শুধু নন, তিনি সে সময়ে সংগীতকে নানা দিক থেকে সংস্কার করে নতুনত্ব আনেন।

মুসলমান শাসক ও পারসিক সংগীতের প্রভাবে ভারতীয় সংগীতের ও জনসধারণের রুচির বিবর্তনের ফলে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে হিন্দু সংগীতের চর্চা ব্যাহত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই প্রতিকূল পরিবেশে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ রাজা মানসিংহ তোমর (রাজ্যকাল ১৪৮৫-১৫১৬ খ্রী: মতান্তরে ১৪৮৬-১৫১৭ খ্রী:) প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন। ইনি ধ্রুপদ গানের পুনরুদ্ধার ও প্রচার করেন অথবা বলা যায় ধ্রুপদের দিশেহারা বিশৃঙ্খল প্রাচীন রূপের সংস্কার করে একটি নির্দিষ্ট সংহত রূপদান করেন যা আজও প্রচলিত। তাই অনেকে তাঁকে ধ্রুপদের জনক বলে থাকেন। মানসিংহের দরবারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পীরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন যাঁরা শৃঙ্খলিত নবসৃষ্ট ধ্রুবপদের চর্চা ও প্রচার করেন যাঁদের মধ্যে বৈজু বাওরা প্রধান। তান সেন (আ.১৫১০/১৫১৫-১৬ - ১৫৮৯ খ্রী:) ধ্রুপদ চর্চা উচ্চতার শিখরে নিয়ে যান। তিনি শুধু শিল্পীই ছিলেন না উচ্চশ্রেণীর স্রষ্টাও ছিলেন— চারতুক বিশিষ্ট বহু ধ্রুপদ গান, অনেক রাগ ইনি সৃষ্টি করেছেন 'মিঞা' বা 'দরবারী' ভণিতায় বা শব্দযোগে। ব্রজভাষা, তথা খড়ীবোলী হিন্দি ভাষাকে খসরুই প্রথম

পরিমার্জিত করে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করে গীত রচনার উপযোগী করেন, এই ধারাতে আজও ধ্রুপদ, ধামার খেয়াল গীত হয়। এছাড়া তিনি ফারসির প্রচুর শব্দ গানে ব্যবহার করেন।[৪৯]

দৃঢ়ভাবে নিয়মাবদ্ধ ধ্রুপদগান চারতুক্ বিশিষ্ট—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। বাঁধা রীতিতে আলাপ শেষ করে মূল-গানে প্রবেশ করে প্রথমে ঠায় লয়ে গেয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ে বিভিন্ন তাল-ছন্দ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গান এগিয়ে যায়। মীড় ও গমক এর প্রধান অলংকার। তানবর্জিত এই সংগীত ভারি রাগ ও তালে গঠিত ও গীত হয় এবং কঠিনভাবে নিয়মাবদ্ধ হওয়ায় এ সংগীতের ভাবপ্রকাশে শিল্পীর কোনো স্বকীয়তা প্রকাশ করার অবকাশ নেই।

অপরদিকে খেয়াল সাধারণত দুই তুক্ বিশিষ্ট —স্থায়ী ও অন্তরা এবং ধ্রুপদের তুলনায় হাল্কা চাল ও দ্রুত লয়ের সংগীত। এ সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ রীতি-পদ্ধতি থাকলেও রাগের বিকাশ, তালের বৈচিত্র্যসৃষ্টি, সুরচিন্তার, তাল-বোলতান-নানা অলংকারের প্রয়োগে শিল্পীর স্বাধীনতা প্রচুর। এই গানে বাণী-অংশ একদমই কম, তুলনায় সুরের লীলার প্রাধান্য। বিখ্যাত খেয়ালিয়া গোলাম নবী (১৭৪২-১৭৯২ খ্রী.) আবার টপ্পার প্রবর্তন করেন পাঞ্জাবের উটচালকদের বিশেষ কম্পনযোগে গীত গানের ভিত্তিতে। দুই তুক্ বিশিষ্ট—স্থায়ী ও অন্তরা (কখনও কখনও তিন বা চার তুক্ও পাওয়া যায়) টপ্পা সংক্ষিপ্ত, হাল্কা ও দ্রুত চালের সহজ, সরল ও লঘু ভাবোদ্দীপক গান। গোলাম নবী শোরী মিঞার ভণিতায় টপ্পা রচনা করেন যা প্রণয়সংগীত।[৫০] জমজমা বা দানাদার তান টপ্পার প্রধান অলংকার। স্থায়ী গাইবার বাঁধা ভঙ্গি, তালের রূপ ও ছকের স্তর বাঁধা হওয়ায় টপ্পার পরিসর সংকীর্ণ। তুলনায় ঠুংরী মুক্ত প্রকৃতির গান যেখানে গায়কের স্বাধীনতা প্রচুর।

ঠুংরীর বিষয়—ঐকান্তিক প্রেমের অভিব্যক্তি যা অধিকাংশেই নায়িকার বয়ানে রচিত। নাটকীয় ভাব প্রকাশের অবাধ সুযোগ থাকায় গণিকা সমাজের প্রধান অবলম্বন ছিল এ সংগীত, যেখানে গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি বা 'ভাও' ছিল প্রধান অঙ্গ। ফলে রুচিবাগীশের কাছে মধুর রসের এ গান প্রথমে অভিজাত গান হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। তবে লক্ষ্ণৌর নবাবর ওয়াজেদ আলীর প্রচেষ্টায় এ সংগীত অভিজাত সমাজে স্থান পায়।

এই যুগে সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতির গঠন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রেও বহুল

পরিবর্তন সাধিত হয়। পখাবজ বা পাখোয়াজের বিকাশ ও সংগীতে বহুল ব্যবহার, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক থেকে তবলার ব্যবহার, মৃদঙ্গের সংস্কার, সেতারের নবরূপ প্রবর্তন ও সংগীতে ব্যবহার আরবি যন্ত্র তানপুরার ব্যবহার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার মুসলিম যুগের দান।[৫১] এগুলির মধ্যে কিছু পারস্য দেশ থেকে আগত, কিছু এদেশেই পূর্ব-প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের সংস্করণসাধনে নতুন রূপ পায়।

মুসলমান শাসনকালের শেষদিকে ঘরানার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গ-জেবের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হিন্দুস্থানী সংগীত বা উত্তর ভারতীয় সংগীতে ছিল 'আচার্য সম্প্রদায়' ও 'গায়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরা'। সম্প্রদায় পদ্ধতিতে যে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ছিল মুখ্য বিষয়। এতে কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞানী (আচার্য) তাঁর অর্জিত জ্ঞান তত্ত্বসহকারে শিষ্যদের বর্ণনা করতেন ও শিক্ষা দিতেন। এঁদের কাছে সংগীত ছিল ধর্ম ও সাধনার বিষয়—শাস্ত্রকে এঁরা প্রাধান্য দিতেন। অপরদিকে গায়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরায় সকলেই জীবিকা হিসাবে সংগীতকে গ্রহণ করেন। জীবিকার প্রয়োজনে এঁরা ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন ফলে একই পরম্পরার গানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে পরম্পরাকে রক্ষা করার জন্য ঘরানার উদ্ভব হয়। ফারসী শব্দ 'ঘর' যার অর্থ পরিবার। আর এর রীতি নীতি ঐতিহ্যকে বলে 'ঘরানা'। সংগীতে ঘরানা হল সংগীতের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা ও সেই মত শিক্ষা দেওয়া যা শিষ্যরা মেনে চলত। প্রত্যেক ঘরানার একজন আদি পুরুষ থাকেন এবং ঘরানার নামকরণ হত ঘরানা স্রষ্টার নামে, সম্প্রদায় অথবা স্থানের নামে। ঘরানার রূপ প্রথমে ছিল বংশ পরম্পরায় আবদ্ধ তার পরে বিকাশ ঘটে শিষ্য পরম্পরায়। ঘরানায় শ্রেণীবিভাগ থাকে—গায়ক ঘরানা, বাদক ঘরানা এবং নর্তক ঘরানা।[৫২]

এই সময়ে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সংগীতের বিভাজন ঘটে বলে অনেকে মনে করেন। একথা ঠিক নয়। প্রথম থেকেই দুই অঞ্চলের সংগীতের পার্থক্য লক্ষিত হয়। মুসলিম পূর্বযুগে ভারতে প্রধানত দু'ধরনের সংগীতের ধারা ছিল — গান্ধর্বসংগীত বা শাস্ত্রমতগত সংগীত এবং দেশী সংগীত বা আঞ্চলিক সংগীত। গান্ধর্বসংগীত ছিল কঠিন নিয়মাবদ্ধ সংগীত, ফলে এ সংগীতের প্রচলন ভারতের যে সমস্ত জায়গায় ছিল সমস্ত জায়গায় এর এক রূপই প্রচলিত ছিল। অপরদিকে দেশী সংগীতে আঞ্চলিক প্রভাব থাকায় তা সর্বত্রই আলাদা। তাই দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের সংগীত পদ্ধতি

বরাবরই আলাদ। পরবর্তীতে যখন গান্ধ র্ব ও দেশী সংগীতের মিশ্রনে 'প্রবন্ধ ' গান সৃষ্টি হয় তখন আঞ্চ লিক বৈশিষ্ট্য কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যেও বজায় ছিল। এছাড়া পূর্বে ভারতীয় সংগীত ছিল প্রধানত মন্দিরাশ্রিত। মুসলমান যুগে উত্তর ভারতের মন্দির ব্যাপক হারে ধবংস হওয়ায় এখানকার আচার্য সম্প্রদায় বা পরম্পরা লুপ্ত হয়ে যায় এবং অনেক আচার্য দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানকার সংগীতকে সমৃদ্ধ করেন। এরপর কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সংগীতের বিকাশ হয়। অপরদিকে উত্তর ভারতে দরবারাশ্রিত সংগীত প্রাধান্য পেতে থাকে এবং সংগীতোপজীবী গায়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরা প্রাধান্য পেতে থাকে, প্রধানত রাজা ও রাজকর্মচারীদের মনোরঞ্জনের দিকে খেয়াল রেখে সংগীতে চমৎকারিত্ব, চটক ও কৌশল প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে—আধ্যাত্মিক ভাবের সাধনার অভিজাত সংগীত অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল, লঘু, চটুল ভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সংগীতে পার্থক্য বড় প্রকট হয়ে পড়ে যা দেখে অনেকে বলে থাকেন যে, মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পৃথক হয়ে পড়ে মূলত মুসলিম প্রভাবের চটুলতা, সহজ-সরল-লঘু ভাব থেকে হিন্দু সংগীতকে রক্ষা করতে। তবে একথা ঠিক—উত্তর ভারতের রক্ষণশীল হিন্দু সংগীতজ্ঞগণ মুসলমান প্রভাব এবং পারসিক সংগীতের প্রভাবে হিন্দু সংগীতের বিবর্তনকে এবং নতুন নতুন সংগীত পদ্ধ তিকে নিজ নিজ মানসিকতা অনুযায়ী কমবেশি মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্য হন মুসলমান সাম্রাজ্যে টিকে থাকতে। কারণ এর সরাসরি বিরোধিতা করে নিজেদের অস্তিত্ব ও সংগীতকে টিকিয়ে রাখার মত মানসিকতা ও পরিস্থিতি তখন ছিল না, আর যাঁরা তা মানতে পারেননি তাঁদের অনেকে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নেন—এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি দক্ষিণ ভারতের সংগীতজ্ঞদের। ফলে সংগীতে রক্ষণশীলতা দক্ষিণ ভারতে রয়েই যায় এবং শাস্ত্রকে স্বীকার করে রক্ষণশীলতার মধ্যেই সেখানকার সংগীত বিকশিত হয় যেখানে নিয়মাবদ্ধ রীতি পদ্ধ তি সংগীতে কঠোরভাবে পালন করা হয়।[৫৩]

লৌকিক সংগীত থেকে মধ্যযুগে লোকসংগীত বা (ফোক সঙ্) বলিষ্ঠ আকার পায়।[৫৪] লোকসংগীতকে নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞায় বেঁধে দেওয়া যায় না। কারণ এ সংগীতের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে বাস্তবমুখিতা ও প্রবহমানতা। অশিক্ষিত মনের স্বাভাবিক প্রেরণাজাত সাংগীতিক নিয়মাদি বর্জিত সহজ-সরল স্থানীয় এই সংগীতের গীতিকার সুরকারের খবর কেউ রাখে না। এর আদি রূপ উপজাতীয় (ট্রাইবাল—ইং) নাচ-গান-বাজনার মধ্যে সুপ্ত ছিল বলে মনে করা হয় যা বহিরাগত উপাদান গ্রহণ ও সাঙ্গীকরণ করে

পরিপুষ্ট হয়েছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ সংগীতের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে এ গানের সুর, ভাষা, ভাব, ছন্দ, যন্ত্রানুষঙ্গ এবং বিশেষ ধরনের কণ্ঠপ্রয়োগের ভঙ্গিতে। লোকসংগীতের সুর হলো শিক্ষা-নিরপেক্ষ, সহজাত, সহজ-সরল প্রাকৃত সুর যা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়। গানের ভাষা আঞ্চলিক যাতে উপজাতীয় ভাষার প্রভাব ও অভিজাত ভাষার ছোঁয়া থাকে, আর আঞ্চলিক প্রভাবান্বিত উচ্চারণ ও কণ্ঠভঙ্গির প্রয়োগ একে স্বতন্ত্রভাবে মাধুর্যমণ্ডিত করে এবং পরিচিতি দেয়। লোকসংগীতের প্রধান সম্পদ এর সহজ সরল ভাব অশিক্ষিত গ্রাম্য ভাষায় রচিত বাণী বা পদ ও সহজ সুরের মিলনে ফুটে ওঠে। আরেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাল বলতে সাধারণত ছন্দ বা রিদ্‌ম কে বোঝায় যা আনদ্ধ বাদ্যে নানা বোল দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তালে সম-ফাঁক বা তালি-খালি নেই সবই 'ঘাত' তবে প্রবল (সমের মত্তে শোনায়) ও দুর্বল (খালি বা ফাঁকের মত্তে শোনায়) —এই দুরকমের। ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র হলো—একতারা, দোতারা, বাঁশী, শিঙা, আনন্দ লহরী, ঢাক, ঢোলক, খোল, মাদল, খঞ্জরী, গোপীযন্ত্র, সারিন্দা, করতাল, মন্দিরা, কাসী, কাঁসর, ঝাঁঝর, ঘন্টা ইত্যাদি। তবে কোনো একপ্রকার লোকসংগীতে দু-একটির বেশি বাদ্যযন্ত্র সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। লোকসংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য চিত্তাকর্ষক। নির্দিষ্ট নিয়মাবদ্ধ না হওয়ায় সাধারণ গ্রামীণ জনজীবন-সম্পৃক্ত প্রায় সমস্ত বিষয়ই এই সংগীতে স্থান পেয়েছে। বিষয়গত দিক থেকে লোকসংগীতকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মোটামুটি এই দু'ভাগে বিভাজিত করা হয় যা প্রত্যেক অঞ্চলের লোকসংগীতেই দেখা যায়।[৫৫] তবে বিষয়গত বিশুদ্ধতা কোনো ভাগেই পুরোপুরি পাওয়া যায় না। লোকসংগীতের মোটামুটি তিন ধরনের রূপ পাওয়া যায়—

এক. আদিম ঘেঁষা রূপ, যেখানে গান সাধারণত যৌথভাবে গাওয়া হয় এবং সুর সহজ সরল বৈচিত্র্যহীন—ঈষৎ অনুন্নত।

দুই. সাধারণ রূপ, যেখানে এককভাবে সাধারণত গান গাওয়া হয় এবং সুর একটু উন্নত, সাধারণ জীবনকেন্দ্রিক গান।

তিন. অভিজাত ঘেঁষা রূপ, যেখানে গান এককভাবে গাওয়া হয় বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর সহযোগে —এতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা রাগের ব্যবহার হয় গানের ভাবকে বজায় রেখে। লোকসংগীতে সাধারণ জনজীবনের ছাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় হুবহু প্রতিফলতি হয়।

অখণ্ড বাংলার কথ্যভাষা-ব্যবহারের[৫৬] নিরিখে লোকসংগীতের বিভিন্ন রূপ পাওয়া

যায়। বলাই বাহুল্য উল্লিখিত সংগীত-নামগুলি ছাড়াও অঞ্চলভেদে, পেশাভেদে, সম্প্রদায়ভেদে আরও অজস্র সংগীতরূপ পাওয়া যায় :

১. রাঢ়ভূমি— মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর— প্রধান লোকসংগীত বাউল, ঝুমুর, ভাদু, টুসু ইত্যাদি।

২. বঙ্গালভূমি বা পূর্ববঙ্গ— খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমগ্র পূর্বাঞ্চল— প্রধান লোকসংগীত ভাটিয়ালী, সারি, জারি প্রভৃতি।

৩. বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ— গঙ্গানদীর উত্তরে রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি সমগ্র উত্তরাঞ্চল, প্রধান লোকসংগীত—ভাওয়াইয়া, চটকা, গম্ভীরা প্রভৃতি।

৪. মধ্যভূমি বা ভব্য ভাষাঞ্চল— কলকাতা থেকে উত্তরে অখণ্ড ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলা। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অনেকটা অঞ্চল ও খুলনা জেলার পশ্চিম সীমান্তের বেশ কিছু অঞ্চল। রামপ্রসাদ ও লালনের গান অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা ও প্রচারের ফলে উপভাষার কিছু কিছু ছাপ পড়ে এখানকার লোকসংগীতের পর্যায় অধিকার করে।

৫. নিম্নভূমি— মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগ ও সুন্দরবন অঞ্চল। এখানকার প্রধান সংগীত হল দক্ষিণ রায়ের গান ও বনবিবির গান।[৫৭]

উপরের তালিকাটি বাংলার লোকসংগীতের আঞ্চলিক প্রসার সম্পর্কে খুবই প্রাথমিক বিবেচনা, বাংলার লোকসংগীতের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র অপেক্ষিত সন্দেহ নেই। বাংলার

মূল লোকসংগীত : রাঢ়ের বাউল, ঝুমুর, বঙ্গালের ভাটিয়ালী, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া। আমাদের কাব্যসংগীতের প্রধান স্তম্ভ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা লঘু-সংগীত, গণসংগীত, এমন-কী বাংলা ব্যাণ্ডের গানের গীতিকার ও সুরকারেরা নানাভাবে লোকগানের বাগ্‌ভঙ্গি ও সুরের কাটামোকে ব্যবহার করেছেন। বাউলাঙ্গ বা কীর্তনাঙ্গের গান, ভাটিয়ালি বা চটকা, গম্ভীরা বা আলকাপ, টুসু বা ভাদু—সব ধরনের লোকগানই বাঙালির কাব্যসংগীতের ধারাকে পুষ্ট করেছে।[৫৮] অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বাংলা গান থেকে এই গ্রহণের সূচনা, আর বিংশ-একবিংশ শতকের নিরীক্ষায় এই ব্যবহারের নির্বিচার পরিনিবৃত্তি। যথাস্থানে এ-বিষয়ে আমরা আলোকপাতের চেষ্টা করব।